রবীন্দ্রনাথের মুল্যায়ন ও মানস বিশ্লেষণে ডঃ হুমায়ুন আজাদ

শাহাদাত হোসেন

রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার তীব্রস্রোতে ধেয়ে আসা পরমসত্তায় বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁর নানা বাজে কথাগুলো আমরা মেনে নেই না, নিতে পারি না। এ-মেনে না নেয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, এ-হচ্ছে সত্য ও নিজের উপলব্ধির কাছে বিশ্বস্ত থাকা, আর সাহিত্য ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা।

> সব মিলে তিনি এমন মহান কবি, যিনি তাঁর সীমাবদ্ধ জাতিকে দিয়ে গেছেন অসীমাবদ্ধতার স্বাদ। তাঁর সমগ্রজাতি হৃদয় দিয়ে যা ধরতে পারে নি, তিনি একা তা ধারণ করে রেখে গেছেন, যাতে তাঁর জাতি সব সময়ই খুঁজে পাবে আন্তর সম্পদ। তিনি তাঁর জাতির জন্যে রেখে গেছেন স্বপ্ন, কল্পনা, প্রেম, সুর, মহত্ত্ব, অজানা ফুলের গন্ধ, এবং কী নয়। আর সৃষ্টি ক'রে গেছেন এক অভিনব বাংলা ভাষা, তার শব্দ ও বাক্যকে করেছেন জ্যোতির্ময়; তাকে নাচিয়েছেন ছন্দে, শিউরে দিয়েছেন মিলে; সাজিয়েছেন অপূর্ব অলঙ্কারে। তিনি মহাকবি, তাঁর মতো আরে কেউ নেই। -ডঃ হুমায়ুন আজাদ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতাঃ অবতরণিকা)

> রবীন্দ্রনাথের মতো একজন স্পর্শকাতর রোম্যান্টিক কবি কী ক'রে এতো সংবেদনহীন হয়ে উঠতে পারেন, তা ভাবতেও শোক জাগে। তিনি স্তব করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শোচনীয় মর্মান্তিক এক ব্যাপারের। হিন্দু বিধবা সব ধরনের বিধবার মধ্যে শোচনীয়তম; তার জীবন হচ্ছে ধারাবাহিক সতীদাহ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন ' হৃদয়ের চরিতার্থতা। যার জীবন সম্পুর্ন শূন্য শুষ্ক পতিত অনুর্বর, তার জীবনকে কতকগুলো নিরর্থক শব্দে পূর্ণ ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ডঃ হুমায়ুন আজাদ (রবীন্দ্রনাথের চোখে 'নারী')

বহুমুখী বিশাল প্রতিভাধর দীর্ঘজীবি ও সার্বক্ষনিক লেখক কবি রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমান এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, কারো পক্ষে ধৈর্য্য ধরে তাঁর রচনার সবটা পড়ে ফেলা খুবই কঠিন, আর দুঃসাধ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সবগুলো লেখার বক্তব্য মনে রেখে এর প্রেক্ষিতে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মুল্যায়ন করা। কিন্তু যারা আজীবন কাটিয়েছেন সাহিত্যের জগতে, লেখাপড়ার নেশা যাদের মগজে রক্তধারার প্রবাহের মতো বয়ে চলেছে আমৃত্যু, তাঁরা সক্ষম হয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে পড়তে, শুধু রবীন্দ্রনাথকে কেনো, বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যের প্রধান লেখকদের রচনাগুলো বেশ ভালভাবে প'ড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি, ভাষাবিজ্ঞানী, কবি, ঔপন্যাসিক, সমালোচক ডঃ হুমায়ুন আজাদ এমন অনেক ভাগ্যবান পড়ুয়াদের একজন। ডঃ আজাদ শুধু পড়েই যান নি, পড়ার সময় সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব যৌক্তিক চিন্তা; আর তার ভিত্তিতে করেছেন রবীন্দ্র-প্রতিভার মুল্যায়ন।

সঠিক মূল্যায়নের জন্যে দরকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা, বস্তুনিষ্ঠ সত্য উদঘাটনে নির্মোহ দৃষ্টভংগি, উপলব্ধির গভীরতা, ও উদঘাটিত সত্য প্রকাশে দৃঢ় সাহস। উল্লিখিত গুনাবলীগুলো ব্যাপক গভীর ও তীব্রভাবেই ছিলো সমালোচক ডঃ হুমায়ুন আজাদের মধ্যে। বিখ্যাত লেখকদের রচনা যেমন পড়তেন তিনি,

তেমনি পড়তেন অনেক সাধারণ লেখদের লেখাও। নিজে যাচাই না করে কারো মহিমার কীর্তনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাঁর নিচের উক্তিটি থেকেই আমরা তা বুঝতে পারি :

> জনশ্রুতি, অনেক সময়, নিজের চেয়ে বড়ো ক'রে তোলে কবিদের, যাচাই করতে গিয়ে দেখি সত্যের মাত্রা কম, অনেক বেশি লোকবিশ্বাস ও দশকপরস্পরার রটনা। ভারতীয় অঞ্চলে সংস্কার ও কিংবদন্তি পরিগ্রহ করতে পারে সাংঘাতিক রূপ; বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে একই শ্লোক পুনারাবৃত্তি ক'রে যেতে পারি আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী, এবং হয়ে উঠতে পারি অন্ধ পৌত্তলিক।

বাংলা ভাষার প্রধান প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদের বিপূল পরিমাণ লেখা যারা পড়েছে তারা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে হূমায়ূন আজাদের পান্ডিত্যের ব্যাপারে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে তিনি বিনা বিবেচনায় কোনো কিছুকেই সত্য বলে মেনে নেন নি। লেখকের প্রতিভার বিশালতা, দশকপরম্পরার কিংবদন্তি বা রটনা, নোবলে প্রাইজ বা আর সব ব্যাপারগুলো -যা অনেক সমালোচককে ভীত ক'রে তোলে লেখকের লেখার গুনাগুন ও তাতে নিহিত সত্য মিথ্যা উদঘাটন ও প্রকাশে, এর কোনকিছুই হুমায়ুন আজাদের প্রতিভাশোভিত যৌক্তিক চিন্তার পথ রুদ্ধ করতে পারে নি কোন লেখকের লেখার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনায়। তাঁর মেধা ও চিত্তে যা সঠিক মনে হয়েছে তা তিনি প্রকাশ করেছেন অকপটে। বাংলার শ্রমনিষ্ঠ মেধাবী সমালোচকদের মধ্যে হুমায়ুন আজাদ অন্যতম। আমাদের বাংগালি তরুন-তরুনীদের প্রথাবিরোধী চিন্তাধারার উদ্ভববিকাশের প্রধাণ প্রেরণা তিনি।

আবাল্য জ্ঞানপিয়াসী ডঃ আজাদের বিপুল পরিমান রচনায় প্রমাণ মেলে তাঁর অগাধ পান্ডিত্যের, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের। নিচের উক্তিটি থেকেই বুঝতে পারি পড়'তে তিনি কেমন চাঞ্চল্য অনুভব করতেন যৌবনের প্রারম্ভেই। প্রথম যৌবনের আগেই ক্ল্যাসিক্যাল রচনাগুলোর পাঠ সেরে ফেলেছিলেন; আর যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলেছিলেন বিশ্বআধুনিক কবিতা, আধুনিক শিল্পকলা, আর বিশশতকের স্বভাব বিষেয়ে লেখা অজস্র রচনা:

> যখন আধুনিক কবিতা , আধুনিক শিল্পকলা, বিশশতকের স্বভাব বিষেয়ে পড়া শুরু করি আমি কৈশোর পেরিয় নতূন যৌবনে পড়ার চাঞ্চল্যকর বয়সে, ভালো লাগতে থাকে ওই কবিতার অভাবিত চিত্রকল্প, অপ্রথাগত সৌন্দর্য, এতোদিন ধ'রে শেখা অনেক কিছুকেই মনে হতে থাকে হাস্যকর্।

আধুনিক সাহিত্য আর শিল্পকলাকে বেশ ভালোভাবেই আত্মস্থ করেছিলেন তিনি। শিল্পকলার বিমানবিকীরণপ্রক্রিয়ার ওপর '**শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ**' নামে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রবন্ধটি তিনিই লেখেন। তিনি উদঘাটন করে দেখিয়েছেন শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব বিকাশ, এর স্বভাব, এবং এর প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের মূল।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি পড়েছেন, বার বার পড়েছেন, বেশ ভালোভাবেই পড়েছেন। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়িয়েছেনও। তিন দশক আধুনিক বাংলা ও বিশ্বকবিতার মধ্যে নিরন্তর বাস করে পঞ্চাশ বয়সের প্রারম্ভে ধীর শান্তভাবে আবারো প'ড়ে ফেলেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের চার হাজারের মতো কবিতা ও গান। এবং সম্পাদনা করেছেন '**রবীন্দ্রনাথের প্রধান কবিতা**'। ডঃ আজাদের নিচের উক্তি থেকেই প্রমাণ মেলে আধুনিক বাংলা ও বিশ্ব কবিতার মধ্যে তাঁর তিন দশক বসবাসের অভিজ্ঞতা ও রবীন্দ্রনাথকে পঞ্চাশের প্রারম্ভে আবারো ধীর শান্তভাবে পড়ে ফেলার সারকথাঃ

> যখন প্রস্তুত হচ্ছি পঞ্চাশ হওয়ার জন্যে, এবং খুব সুখী বোধ করতে পারছি না, তখন ঘটলো এ-অসামান্য অভিজ্ঞতাটি। ধীরশান্তভাবে প'ড়ে উঠলাম তাঁর চার হাজারের মতো কবিতা ও গান; মনে হলো ধন্য হচ্ছে আমার ভোর, দুপুর , সন্ধা, রাত্রিগুলো; আমার মেঘ, শিউলি,জ্যোৎস্না, অন্ধকার; আমার প্রত্যেক মূহূর্ত, প্রতিটি তুচ্ছ বস্তু।্ আধুনিক বাংলা ও বিশ্বকবিতার মধ্যে আমি তিন দশক বাস করেছি; তার অসামান্যতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু ও কবিতা এক বিমানবিক বিশ্বের কবিতা; সেখানে লীলা নেই বসন্ত শরতের , সেখানে আকাশ কালো হয়ে আসে না মেঘে মেঘে, বাজে না বৃষ্টির শব্দ, সেখানে মানুষও প্রায় অনুপস্থিত। মানবিক অম্লজানের বদলে সেখানে নিশ্বাস নিতে হয় শৈল্পিক অম্লজান; বাস করতে হয় শিখর বা বদ্ধ মিনারের অপূর্ব নিঃসংগতায়।

রবীন্দ্রকাব্যের তীব্রতম মানবিক আবেগ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তাঁর মেধা আর চিত্তকে করেছিলো প্রচন্ড আলোড়িত। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথকে পড়েনই নি , যাপন করেছেন তাঁর কবিতার ভুবনে। এ-প্রসংগে তাঁর নিজেরই কথাঃ

> যতোই পড়ছিলাম তাঁর কবিতা, সহজ হয়ে উঠছিলো আমার নিশ্বাস, সজীব হয়ে উঠছিলো ইন্দ্রিয়গুলো।্ তাঁর কবিতা পড়ছিলেন সুখে; কিছুই বুঝে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করতে হচ্ছিলো না, যেমন শিউলি বা বৃষ্টি বা হাহাকার বুঝে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করি না আমরা, ওগুলো বুঝার আনেক আগেই হৃদয়ে সংক্রামিত হয়; আলোড়িত হচ্ছিলাম, আমার অনুভুতি কোষে ঝ'রে পড়ছিলো প্রকৃতি ও প্রেমিকের আবেগ। পঞ্চাশের পূর্বাহ্নে তিনি মনে করিয়ে দিলেন আজো পারি আমি কাতর হ'তে, দীর্ঘশ্বাস আজো বেরিয়ে আসতে পারে আমার বুক থেকে, এমনকি চোখের পাতায়ও জ'মে উঠতে পারে একফোঁটা অতল জল।্ **তিনি কবি, কবিদের রাজা, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ।** তাঁর মতো আর কেউ পায় নি, তাঁর মতো আর কেউ দেয় নি।

অবতরনিকাটিতে চমৎকারভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক প্রতিভা, কাব্যিক স্বভাব, আর রোম্যান্টিজমের বৈশিষ্ট্যগুলোর সার সংক্ষেপ। বিশ্বের আর সব রোম্যান্টিকদের সাথে রবীন্দ্রনাথকে তুলনা ক'রে তিনি বলেছেন এমন অভিনব কথাঃ

> বিশ্বের মহোত্তম রোম্যান্টিদের একজন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যে পাই রোম্যান্টিসিজমের বৈশিষ্টগুলোর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, যা পাই না আর কারো মধ্যে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা অহমিকা, মৌলিকত্ব, কল্পনাপ্রতিভা, স্বতস্ফুর্ততা, আবগেনাভুতি ও আরো অজস্র ব্যাপার যেমন ব্যাপক, গভীর, তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গানে, তা আর কোথাও হয় নি। তীব্রতায় তিনি অদ্বিতীয়, শেলির থেকেও অনেক বেশি তীব্র। বিলেতের পাঁচ রোম্যান্টিক - ওয়র্ডসওঅর্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটস, বায়রন- মিলে যা ক'রে গেছেন, বাংলায় একলা তিনি করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি।

উল্লিখিত উক্তিটি থেকে আরো একটি ব্যাপার পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে তিনি শুধু রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথকেই পুরোপুরি পাঠ করেন নি, অধ্যয়ন করেছেন, আত্মস্থ করেছেন বিলেতের পাঁচজন শ্রেষ্ট রোম্যান্টিকক ও বিশ্বের আর সব প্রধান রোম্যান্টিক কবিদের বিপূল পরিমান কবিতাও। আর তাদের সাথে তুলনামুলক মুল্যায়ন ক'রেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কবি।'

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আপাদশির রোম্যান্টিক । হুমায়ূন আজাদ বলেনঃ ' রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পৃথিবীর শ্রেষ্ট রোম্যান্টিক কবি।' বাংলা ভাষায় প্রথম ডঃ আজাদের উক্তিতেই পাই রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভববিকাশ ও বৈশিষ্টের জ্ঞানগর্ভী সার সংক্ষেপঃ

> আঠারো শতকের শেষ দিকে ইউরোপে দেখা দিয়েছিলো এই সংবেদনশীলতা, এবং মানবজাতি নিয়েছিলো এক বড়ো বাঁক। সেই থেকে মানুষের সভ্যতা হয়ে ওঠে রোম্যান্টিক, মানুষের পক্ষে আর সম্পূর্ণরূপের অরোম্যান্টিক থাকা হয়ে ওঠে অসম্ভব। বিশশতকের শিল্পকলা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে একে, কিন্তু পারে নি; ্কবিতালোকে তাঁরা সৃষ্টি করেন অভনিব কবিতা; বলতে পারি যে প্রকৃত কবিতার সূচনাই করেন রোম্যান্টিকেরা। আগে কবিতা ছিলো সাধারণত ছন্দোবদ্ধ গদ্য, যা রচিত হতো প্রথাগত যুক্তি, নিয়মকানুন, সুষমা মেনে; তাঁরা বাদ দেন এসব। তাঁরা সৃষ্টি করেন নতুন আদর্শ, জোর দেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কল্পনাপ্রতিভা, স্বতস্ফুর্ততা, ও আবেগের ওপর। কবিতা লেখার বিধিবদ্ধ নিয়মগুলো ভেংগে ফেলেন তাঁরা; তাঁরা আর কবিতা লেখেন না, রচনা করেন না, নির্মাণ করেন না, তাঁরা সৃষ্টি করেন কবিতা। ত্যাগ করেন আরিস্তলীয় অনুকরনবাদ; তাঁরা দর্পন হ'তে চান না, হয়ে ওঠেন প্রদীপশিখা, যা আলোকিত করে অন্ধকারকে।্ রোম্যান্টিকেরা কবিতার পুরোনো আদর্শগুলো ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কল্পনা প্রতিভা, মৌলিকত্ব, আবেগঅনুভুতি, অনুপ্রেরণার ওপর জোর দিয়ে সূচনা করেন কবিতার নতুন সময়; সৃষ্টি করেন এমন কবিতা, যা আগে কখনো ছিলো না, এবং যার মহাপ্লাবনে সুখকরূপের প্লাবিত হয় বিশ্ব।

এরপর তিনি উদঘাটন করেন রোম্যান্টিক কবির দৃষ্টিভংগি, মানসরূপ ও প্রবনতাঃ

> ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের চরম রূপটি গ্রহন করেন তাঁরা্। রোম্যান্টিক কবি বাহ্যজগৎকে দেখেন নিজের অহংবোধের ভেতর দিয়ে; তিনি মম্ময়, আমিময়; তিনি বস্তুগত দৃষ্টিতে জগতকে দেখেন না । কানো কিছু কেমন, তার স্বরূপ কী, তা মূল্যবান নয় রোম্যান্টিকের কাছে; তাঁর কাছে মূল্যবান হচ্ছে বস্তুটি তাঁর কেমন মনে হয়।

রোম্যান্টিক রবীন্দ্রমানস উদঘাটন ক'রে তিনি বলেছেন এমন অভিনব কথাঃ

> রোম্যান্টিকের আমিময়তার চরম ঘোষনা পাই রবীন্দ্রনাথেই। ' আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, / চুনি উঠলো রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে-/জ্বলে উঠলো আলো/ পুবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'-/ সুন্দর হলো সে।' তিনি কোন কিছুকেই বস্তুগতভাবে মেনে নিচ্ছেন না, স্বীকার করছেন না কারো নিজস্ব বৈশিষ্টকেই; সব কিছুতেই তিনি সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছেন নিজেকে। পান্নাচুন্নির নিজস্ব রং যেমন স্বীকার করছেন না, তেমনি স্বীকার করচেন না সূর্যকে ও গোলাপের সৌন্দর্যকে; তাঁর কাছে তাই সত্য যা তাঁর মন সত্য বলে মেনেছে।্। এর আগে প্রকৃতিকে মনে করা হতো যন্ত্র, যা পূর্বনির্ধারিত নিয়মে যান্ত্রিকভাবে চলছে। রোম্যান্টিকরা এই যান্ত্রিক প্রকৃতি ধারণা বাদ দিয়ে নেন এক সজীব গতিময় প্রকৃতির ধারণা। তবে তাঁদের অনেকেই প্রকৃতিকে প্রকৃতি হিশেবে নেন নি, নিয়েছেন নিজেরই সত্তার সম্প্রসারণরূপে, শেলির 'পশ্চিমা বায়ুর প্রতি', বা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' যার ভাল উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথ এক বিশাল হৃদয়াবেগের নাম। তাঁর কবিতা এক বিশাল বা অসীম মানবিক ভুবণ, যা তীব্রতম আবেগে আলোড়িত। কবিতার কোনো বিশেষ সংজ্ঞায় তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন নি তিনি; অবলীলায় যেমন তিনি লিখেছেন অজস্র বিশুদ্ধ কবিতা, তেমনি লিখেছেন প্রচুর ছন্দোবদ্ধ রচনা; যেমন লিখেছেন তীব্রতম

হাহাকার, তেমনি লিখেছেন আটপৌরে কাহিনী; লিখেছেন ব্যঙ্গ কবিতা, নীতিকথা, পৌরানিক উপাখ্যান, ছোটদের জন্যে কবিতা। তাঁর কাব্যিক প্রতিভায় অভিভুত হুমায়ুন আজাদ উল্লসিত হ'য়ে বলেছেন :

> সব মিলে তিনি এমন মহান কবি, যিনি তাঁর সীমাবদ্ধ জাতিকে দিয়ে গেছেন অসীমাবদ্ধতার স্বাদ। তাঁর সমগ্রজাতি হৃদয় দিয়ে যা ধরতে পারে নি, তিনি একা তা ধারণ করে রেখে গেছেন, যাতে তাঁর জাতি সব সময়ই খুঁজে পাবে আন্তর সম্পদ। তিনি তাঁর জাতির জন্যে রেখে গেছেন স্বপ্ন, কল্পনা, প্রেম, সুর, মহত্ত্ব, অজানা ফুলের গন্ধ, এবং কী নয়। আর সৃষ্টি ক'রে গেছেন এক অভিনব বা-লা ভাষা, তার শব্দ ও বাক্যকে করেছেন জ্যোতির্ময়; তাকে নাচিয়েছেন ছন্দে, শিউরে দিয়েছেন মিলে; সাজিয়েছেন অপূর্ব অলঙ্কারে। তিনি মহাকবি, তাঁর মতো আর কেউ নেই।

হুমায়ুন আজাদের কাছে একজন রবীন্দ্রনাথ অনেকগুণে মহত্তর ও মুল্যবান একজন গান্ধীর চেয়ে । ডঃ আজাদ বলেনঃ

> গান্ধীর সাথে তুলনা করলেই বুঝা যায় ওই রাজনীতিক , বাস্তবকে দখল যার লক্ষ্য, তাঁর পায়ের নিচে শক্ত মাটি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, ওই রাজনীতিকের চেয়ে বহুগুনে মহত্তর হওয়া সত্ত্বেও, বারবার বোধ করেন যে তাঁর পায়ের মাটি থরথর ক'রে কাঁপছে। এ-বাস্তব বিশ্বে একজন তৃতীয় মানের রাজনীতিক অনেক শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত একজন অমর প্রথম শ্রেণীর কবির থেকে।

কাব্য ও সাহিত্যের অন্যান্য আংগিকে রবীন্দ্রনাথের বিশাল-ব্যাপক প্রতিভাকে অস্বীকারের কথাই উঠে না, যেমনি করে কোনো সংশয় জাগে না দান্তে বা টি.এস.এলিয়টের কাব্য-প্রতিভার বিশালত্বকে স্বীকার করতে, বা সুযোগ থাকে না উইলিয়াম ব্ল্যাকের প্রতিভাকে অবহেলা করার। কিন্তু তাঁদের কাব্যের জগতটি যে-বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে তা অস্বীকার করি আমরা, তা আমাদের কাছে হাস্যকর, যদিও তা প্রবীণ শিশুদের রূপকথার স্বাদ দেয়। রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার তীব্রস্রোতে ধেয়ে আসা পরমসত্তায় বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁর নানা বাজে কথাগুলো আমরা মেনে নেই না, নিতে পারি না। এ-মেনে না নেয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, এ-হচ্ছে সত্য ও নিজের উপলব্ধির কাছে বিশ্বস্ত থাকা, আর সাহিত্য ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা। জানি না যেসব নাস্তিক রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া করেন, তারা আমাদের এ-মেনে না নেওয়াটাকে কিভাবে নেবেন!

বিশ্বাসের সাথে কবিতার পার্থ্যক্য ভালভাবেই করতে পেরেছিলেন হুমায়ুন আজাদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক প্রতিভাকে স্বীকার ক'রেও তিনি বাতিল ক'রে দিয়েছেন প্রথা ও পরিবার থেকে পাওয়া তাঁর পরমসত্তায় বিশ্বাসের হাস্যকর ব্যাপারটি। এ-প্রসংগে ডঃ আজাদ বলেনঃ

> রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় বিশ্বাসের পরম রূপ; বিশ্বের রহস্যীকরণের এক প্রধান ঐন্দ্রজালিক। তাঁর কবিতা ও গানে, এবং বহু প্রবন্ধে, পাই বিশ্বাসের কাঠামোর ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ যে -বিশ্বাস পোষণ করেছেন, তা ভেতর থেকে উঠে আসে নি তাঁর; উঠে এসেছে পরিবার থেকে, এবং তাকে তিনি উপনিষদের বহু সুন্দর মিথ্যেয় সাজিয়েছেন জীবন ভ'রে। তিনি বিশ্বাস করতেন এক পরমসত্তায়, ওটা তাঁর নিজের উপলব্ধি নয়, পরের উপলব্ধি; তাঁর পিতা বহুদেবতাবাদী ধর্ম ছেড়ে একদেবতাবাদী পরমসত্তার্য বিশ্বাস না আনলে, তাঁর পরিবার ওই একক পরমসত্তার স্তবে মুখর না হ'লে তিনিও থেকে যেতেন বহুদেবতাবাদী।
> রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যেগুলোকে বলেছেন 'পূজা', সেগুলোতে বিশ্বজগতের

> রহস্যীকরণপ্রক্রিয়া নিয়েছে চূড়ান্তরূপ। ধর্ম প্রবর্তক বা প্রচারকের মতো তিনি কাজ করেন নি। কিন্তু অলীক পরমসত্তায় বিশ্বাস আলোবাতাসের মতো এগুলোতে কাজ ক'রে চলেছে। এগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর।

কিন্তু আমরা উপভোগ করি রবীন্দ্রনাথের এসব অসামান্য কবিতা , উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটকগুলো। ডঃ হুমায়ুন আজাদ রবীন্দ্রনাথের এ-সকল পরমসত্তায় বিশ্বাস ভিত্তিক রচনা উপভোগ করার ব্যাপারে বলেন এমন কথা :

> এগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর; এগুলোকে উপভোগ করার জন্যে বেশ খানিকটা বিশ্বাস দরকার। তবে বিশ্বাস করেন না যাঁরা, পরমসত্তা যাঁদের কাছে হাস্যকর, তাঁরা এগুলো কিভাবে উপভোগ করেন বা আদৌ উপভোগ করবেন কি? রবীন্দ্রনাথের প্রভু বা পরমসত্তায় বিশ্বাস হাস্যকর আমার কাছে, তবে আমি উপভোগ করি এগুলো, বোধ করি এগুলো উপভোগ করি আমি এগুলোর তীব্র আবেগ , মানবিক অনুভুতির অতুলনীয়তা, অসাধারণ সৌন্দর্য, পার্থিব চিত্রের পর চিত্র, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতির জন্যে। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা,আবেগতীব্রতা ও রূপময়তার জন্যে মাঝেমাঝে যা বিশ্বাস করি না, তাও আমাকে অভিভূত করে, শিউরে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর বিশ্বাস ও মতের প্রায় সবটাই পেয়েছিলেন প্রথা থেকে তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন 'পত্রপূট-এর পনেরো সংখ্যক কবিতায়।

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
আজ আপন মনে ভাবি,
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পুজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরনীয় প্রমাণ করবো ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।

তাঁর সম্পূর্ণ কল্পজগতটিই দাঁড়িয়ে আছে শোচনীয় শূন্যতার ওপর। যারা প্রগতিশীল, পরম সত্তায় বিশ্বাস যাদের কাছে হাস্যকর, তারা কি করে মেনে নেবে রবীন্দ্রনাথের পরমসত্ত্বায় বিশ্বাসের ব্যাপারটি। এ-হাস্যকর ব্যাপারটি অস্বীকার করার জন্যে কি আমাদের হতে হবে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী কোনো সাহিত্যিক?

আর কারো চেয়ে কম রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন না ডঃ আজাদ। রবীন্দ্রনাথের এরূপ মানসিকতার কারণও দেখিয়েছেন তিনি। আর আক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথের এমন প্রবনতার।এ-ব্যাপারে হুমায়ুন আজাদের নিচের বক্তব্যটি স্মরণীয়ঃ

> তিঁনি নিজে যদি খুঁজতেন নিজের বিশ্বাস, তাহলে হয়তো বিশ্বাস করতেন না; তাঁর

সে মানসিকতা ছিলো না, পরিবারের পরমসত্তাকে অস্বীকার করার মতো প্রথাবিরোধীও ছিলেন না তিনি। **তাঁর মতো অসাধারণ মানুষই** যেখানে বিশ্বাস লাভ করেন পরিবার, প্রথা, সমাজ, গ্রন্থ থেকে, এবং ভুল বিশ্বাস্কে দীর্ঘ জীবন ধ'রে মহিমামন্ডিত করতে থাকেন , সেখানে সাধারণ মানুষ আর কী করতে পারে! প্রথা মেনে নেয়ার সুবিধা অনেক, না মানার বিপদ অজস্র।

বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথই চরম ও পরম কথা নয়। তাঁর অনেক কবিতাই কালোত্তর, কিন্তু অ-বিংশ শতকি;- আধার ও আধেয়ের উভয় স্তরেই। তিরিশি কবিতা, যার প্রিয় পরিচিত সৎ নামান্তর আধুনিক কবিতা; এ-কবিতার মুখোমুখী হ'লে যে বোধ ঢোকে আমাদের চেতনা চৈতন্যে, তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। ওই বোধ একাধিক বিশ্বযুদ্ধঅভিজ্ঞ, বহুবিশ্বাসরিক্ত , ব্যাপক নতুন নিজস্ব জটিলতাখচিত বিংশশতাব্দীর। বাংলা ভাষার বিস্তৃতি ঘটেছে অভাবিতরূপে আধুনিক কবিতায়; জীবনান্দ বাংলাকে করে তুলেছিলেন স্বপ্ন-ভাষা, সুধীন্দ্রনাথ তাকে দিয়েছেন স্পন্দিত ধাতবতা, বুদ্ধদেবের কাছে বাংলা ভাষা পেলো জটিল সৌন্দর্য; বিষ্ণু দে বাংলাকে দিলেন দর্প, আর অমিয় চক্রবর্তী দিলেন শুভ্রতা। একদশকেই বাংলা ভাষায় আবির্ভুত হয়েছিলেন এমন পাঁচজন, যাঁরা হাজার বছরের বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ দশজনের অন্তর্ভুক্ত। এ- কবিতার অসাধারণ বৈশিষ্ট প্রসংগে ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেনঃ

এ-কবিতায় প্রথম যে-অভিনবত্বের মুখোমুখি হ'তে হয়, তা ভাষা; এবং ওই ভাষা বারবার মনে করায় যে এ-কবিগোত্র যেনো আবিস্কার করেছেন বাংলা ভাষার এক নতুন অভিধান, যা আগে কখনো জানা ছিলো না। কবিতার কলাপ্রকৌশলেও সঞ্চারিত হলো নতুন বিপ্লবের নতুন আবিস্কাররাশি- ছন্দের লীলালাস্যের বদলে দেখা দিলো মহিমা, উপমারূপকের শিশুসারল্যের স্থান দখল করলো মনস্বী-জটিলত্া। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো বিপ্লব ঘটে আবেগ-চৈতন্য-সংবেদনশীলতার জগতেঃ রবীন্দ্রনাথ, ও তাঁর অনুকারীদের কবিতা যে- আবেগ উছলে পড়ার পাঠ দিয়েছিলো, যে- সমস্ত উদ্দীপকের ক্রিয়ায় সাড়া দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম আমরা, এ- কবিতা তার থেকে অনেক পৃথক, ও বিপরীত আবেগ ও উদ্দীপক উপস্থিত করলো; এবং তাতে সাড়া দিতে বাধ্য হলাম আমরা। যার সাহায্য বুঝতে পারলাম যে তিরিশপূর্ব কবিতার অধিকাংশ আবেগই বানানো ও পানসে। বিষয়বস্তুতে সঞ্চার করলেন যে চিন্তা-চেতনা আবেগ, তা পূর্ববর্তী কবিমন্ডলির চিন্তা-চেতনা আবেগ থেকে অন্তত এক শতাব্দী অগ্রসর।

তাঁদের অনুপ্রেরণা ও মানসিক প্রবণতা বিশ্লেষণ ক'রে ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেন :

তাঁদের খোঁজার বিষয় ছিলো তা, যা নেই রবীন্দ্রনাথে। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতাকে তাঁরা বিবেচনার মধ্যেই আনেন নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক রচনাপুঞ্জে যা নেই , তা-ই আধুনিক এমন একটি বোধ ছিলো তাঁদের। রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্তসদগুনের আধার, তাঁদের সন্ধানের বিষয় ছিলো সে-সমস্তের বিপরীত বস্তু। প্রতীকী কবিতা মনোহরণ করলো কারো, কারো প্রেরণারূপে দেখা দিলো পরাবাস্তবতাবাদ, কারো কবিতা হয়ে উঠতে লাগলো সাম্যবাদী ইশতেহারের আজ্ঞায়। তিরিশি পাঁচজন বাংলা সাহিত্য নামক হাজার বছুব্যাপী সমতল সমুদ্রে জাগালেন বিংশ শতাব্দীর ঢেউ ও বেগ। আধশতাব্দী ধ'রে এ-কবিতা শাসন করছে বাংলা ভাষাকে।

তিরিশি পাঁচজনের কাব্যচেতনায় যদি এমন দ্রোহ না দেখা দিতো, তাহলে আমরা এমন অভাবিতরূপে আধুনিক কবিতা পেতাম না। আমরা পেতাম রবীন্দ্রানুকারী শাহাদাৎ হোসেন, আবদুল কাদির, গোলাম মোস্তফা, সুফিয়া কামাল, মহিউদ্দিন, বে-নজীর আহমেদ ও তাঁদের সমকালীন আরো অনেকের কবিতা -

যাতে তরল স্রোত বয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের হাজার হাজার সৌন্দর্য্য স্বপ্ন আবেগখচিত স্তবের পানসে ও নকল রূপ।

বিনা বিবেচনায় কোনোকিছুকে শিরোধার্য না করার দ্রোহ বহন করতেন ডঃ আজাদ সারা রক্তমাংশ দেহে। কারো বক্তব্য থেকে নিহিত সত্যটুকু উদঘাটনে বেশ নির্মোহভাবে এগুতেন অধ্যাপক আজাদ। খাঁটি সোনা থেকে খাদকে আলাদা করার মতো অসামান্য প্রতিভা বহন করতেন তিনি । তাঁই রবীন্দ্রসমালোচনা করতে গিয়ে তিনি একদিকে যেমন উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন তাঁর কাব্যপ্রতিভার- যা রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য, ঠিক অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তায় বিশ্বাসের ব্যাপারটিকে করেছেন পরিহাস। ডঃ আজাদ জানতেন তিনি বসেছেন রবীন্দ্রনাথের মুল্যায়ন করতে; তাঁর অন্ধ স্তব বা পূজা করতে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্ত প্রশংসা করতে একদিকে যেমন কার্পন্য করেন নি তিনি, অপরদিকে তেমনি দ্বিধা করেন নি জগৎ সংসারের নানা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অজস্র বাজে দর্শনকে বাতিল ক'রে দিতে। নারীর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ পুষতেন নানা বাজে ধারণা। অন্ধ রবীন্দ্রাবেগে ভেসে না গিয়ে ডঃ আজাদ নির্মোহ দৃষ্টিতে উদঘাটন ক'রে দেখিয়েছেন তার ভয়ংকর রূপ। ডঃ হুমায়ুন আজাদের বেশ প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সত্যানুসন্ধানী ডঃ আজাদ প্রথাগতদের মতো এড়িয়ে যান নি রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তায় বিশ্বাস ও নারীতত্ত্বের সঠিক মুল্যায়নের ব্যাপারটি। বেশ যুক্তিসম্মতভাবে তিনি বাতিল করে দেন এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অজস্র বাজে কথার। মনে পরে নারীবাদের আদি জননী মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটেকে। ওলস্টোনক্র্যাফটের প্রিয় দার্শিনিক ছিলেন রুশো; কিন্তু রুশোর নারীতত্ত্ববাতিল করে দিয়েছিলেন মেরি যুক্তি সম্মতভাবেই। কারণ বিনা বিবেচনায় কাউকে পুরোপুরি গ্রহন করা প্রথাবাদীর কাজ; যাদের কাজ মানবতার মুক্তি ঘটানো, তারা পারেন না কারো প্রতি বিবেচনাহীন অন্ধ আনুগত্য করতে।

রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ সব কিছুকেই দেখেছেন রোম্যান্টিকের দৃষ্টিতে। তাঁর এই রোম্যান্টিক প্রতিভা বেশ উপকারে এসেছে বাংলা কাব্যের, কিন্তুভয়ংকর ক্ষতি ক'রেছে নারীমুক্তির। রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধীতাও লক্ষ্য করার মতো। যদিও কখনো কখনো তিনি নিজে খুঁজতে চেয়েছেন সত্য, বলেছেন নিজের উপলব্ধির কথা, কিন্তুপরিশেষে তিনি প্রথার কাছেই করেছেন আত্মসমর্পন। *য়ুরুপ প্রবাসীর* পত্রে তিনি নারী স্বাধীনতার অর্থাৎ নারী-পুরুষের মেলা মেশার পক্ষে কিছু মত প্রকাশ করেছিলেন, তিনি বাংগালি নারীদের ঘরে আটকে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত করেছিলেন পুরুষদের। তিনি বলেছিলেনঃ

> একজন বুদ্ধি ও হৃদয়বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মতো সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিস গড়ে তোলা এসকল যদি পাপ না হয়, তবে নরহত্যাও পাপ নয়।
> (য়ুরোপ প্রবাসী পত্র থেকে বর্জিত, উদ্ধৃত অনন্যা -১৩৯৪, ২০)

এমন নারীস্বাধীনতাবোধবাহী উক্তিটি প'রে বই থেকে বর্জন করে তিনি ভারতীয় প্রথার কাছে করেছেন নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পন। পরবর্তীতে প্রকৃতির দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এমন কথা যা আসলে নারী সম্পর্কে ভারতীয় প্রথারই রোম্যান্টিক রাবীন্দ্রীক রূপঃ

> যেমন করেই বলো প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি পৃকৃতির সেই রকম অভিপ্রায় না হত তাহলে মেয়েরা বলিষ্ট হয়ে জন্মাত। যদি বল পুরুষের অত্যাচারে মেয়েদের এমন অবস্থা হয়েছে, সে কোন কাজেরই কথা নয়।

রোম্যান্টিক কবিদের প্রধান কাজই ছিলো প্রকৃতির কথা শুনা, বুঝা, আর প্রকৃতির সে স্বরকে কাব্যিক রূপ দেওয়া। তবে তাঁরা তা শুনতে পেতেন নিজেদের কল্পনায়। কিন্তু সে প্রকৃতি উপলব্ধির দাবীতে নারীমুক্তি বিরোধী এমন ভাবালু তত্ত্বপেশ করা খুবই ক্ষতিকর মানবপ্রজাতির জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ কেবল যে নারীমুক্তি চাইতেন না তা নয়; বরং নারীমুক্তির প্রচেষ্টাকে তিরস্কার ক'রে তাকে বলেছেন অসংগত ও অমংগলজনক। এতে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ ক'রেছেন যে তিনি ছিলেন নারীপ্রগতির শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ডঃ হুমায়ুন আজাদ এ-প্রসংগে বলেনঃ

> রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে তাকে বলেছেন 'কোলাহল' এবং নারী অধীনতাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন এমন কথা, যা শুধু নারীমুক্তির বিরুদ্ধেই যায় না, যায় মানুষের সব রকম মুক্তির বিরুদ্ধেই।

প্রমাণ হিসেবে ডঃ আজাদ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের এই ভয়ংকর প্রতিক্রিয়াশীল উক্তিটিঃ

> আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে সেটা আমার অসংগত ও অমংগলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহনকে একটা ধর্ম মনে করতো; তাতে এই হতো যে, চরিত্রের ওপর অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমনকি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্বসম্পাদন করত। প্রভু ভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানী হয় না।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের ব্যাখ্যা ক'রে একে বাতিল ক'রে দিয়ে ডঃ আজাদ বলেন এমন কথাঃ

> এর অর্থ হচ্ছে অধীনতা মেনে নেয়াই মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ অন্যায়। এ-ধরনের বিশ্বাস অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এমন প্রতিক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্য সব রকমের শোষনকে তরল আধ্যাত্মিকতা দিয়ে গ্রহনযোগ্য করে তোলা। নারী-আন্দোলন তাঁর কাছে অমংগলজনক, তা হ'তে পারে; কিন্তু মংগলজনক নারী আর অধিকাংশ মানুষের জন্যে যারা বিশ্বাস ক'রে সাম্যে।

অনেকেই নারীমুক্তিবিরোধী রবীন্দ্রতত্ত্বের উৎকট ধারণায় লজ্জা পেয়ে দোহাই দেন কালের। তারা বলেন রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ের সে-সময়ের প্রচলিত সামাজিক অবস্থা অনুসারেই তাঁর মতামত মুল্যায়ন করতে হবে। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, মিল, এদের কথা ছেড়েই দিলাম । ভারতেরই এক নারী -কৃষ্ণভাবিনী, নারীশিক্ষার দাবীতে লেখেন 'শিক্ষিত নারী' (১২৯৮) নামে এক প্রবন্ধ। তাঁর দাবীও ছিলো সামান্য। নারীকে তিনি ঘরছাড়া করতে চান নি; চেয়েছিলেন শিক্ষার সাহায্যে উন্নতজাতের নারী উৎপাদন করতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এতে আহত বোধ করেন। পয়গম্বররা যেমন দাবী করেন নিজে একা বিধাতার অশ্রুত বানী শ্রবণের, আর সবাইকে পথ চলতে বলেন তাঁর শ্রুত বানী অনুসারে , তেমনি রবীন্দ্রনাথও নারীপ্রকৃতির ব্যাপারে প্রকৃতির গোপন বানীর মর্মকথা একা বুঝে ফেলার দাবী ক'রে বলেন এমন ভংয়কর কথা, যা শুনে মনে হয় নারী-পুরুষের স্বভাবের ব্যাপারে ধ্রুব সত্যকথা ঘোষণা করছেন এক মহা প্রকৃতি বিজ্ঞানী:

> প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্য্যভার ও তদুনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন- পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে- অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। (উদ্ধৃত অনন্যা -১৩৯৪, ১৯)

এ-প্রসংগে ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেন :

> কৃষ-ভাবিনী শিক্ষিত নারী' (১২৯৮) নামের একটি প্রবন্ধে দাবী করেন নারী শিক্ষা, চান কিছুটা স্বাধীনতা, কিন্তুরবীন্দ্রনাথ ব্যাগ্র হয়ে পড়েন নারীকে ঘরে আটকে রাখার জন্যে। তিনি নিজেকে দেখেন পুরুষতন্ত্রের মুখপাত্ররূপে, যাকে বাঁচানো তাঁর কাজ, যার মহিমা রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব। পুরুষ যে নারীকে আটকে রেখেছেন ঘরে, কৃষ-ভাবিনীর এ- অভিযোগ কাটানোর জন্যে তিনি আবার দোহাই দেন প্রকৃতির।

নারীর স্তবও করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তুতাও নারীকে বশে রাখার জন্যেইঃ

> নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। তিনি পুরুষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে, তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষু-তা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। (উদ্ধৃত অনন্যা -১৩৯৪, ২১)

এখানেও ভিক্টোরীয়দের সাথে মিল রয়েছে রবীন্দ্রনাথের। ভিক্টোরীয়রাও নারীকে উৎকৃষ্ট বলে প্রশংসা করেছে। তাঁদের 'উৎকৃষ্ট' কথাটি ছিলো একটি নিরর্থক সুভাষন মাত্র। সে-নারীই তাঁদের কাছে উৎকৃষ্ট , যে পুরুষের অধীনে থাকে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন :'এটা এক পরিহাস যে উৎকৃষ্টরা থাকবে নিকৃষ্টদের অধীনে'! মিল যেখানে পরিহাস করেছেন ভিক্টোরীয়দের এই নিরর্থক সুভাষনকে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাকেই পুনারাবৃত্তি করেছেন অন্ধের মতো।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন আমদের ভারতীয় উপমহাদেশের পরিবারগুলোতে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমনটি করে না ইংরেজ -পরিবারে। এ-প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ বলেন এমন মর্মস্পর্শী কথাঃ

> বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না , বাহুদুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না । তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী। এজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস ও স্নেহশীল হয়ে থাকেন। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সংগে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্ববন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সংগে স্নেহ-ভক্তি-পরিহাসের বিচিত্র স ম্বন্ধ; গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তুবিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোনটুকুও উদবৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।

ডঃ আজাদ এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ

> রবীন্দ্রনাথের মতো একজন স্পর্শকাতর রোম্যান্টিক কবি কী ক'রে এতো সংবেদনহীন হয়ে উঠতে পারেন, তা ভাবতেও শোক জাগে। তিনি স্তব করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শোচনীয় মর্মান্তিক এক ব্যাপারের। হিন্দু বিধবা সব ধরনের বিধবার মধ্যে শোচনীয়তম; তার জীবন হচ্ছে ধারাবাহিক সতীদাহ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন ' হৃদয়ের চরিতার্থতা। যার জীবন সম্পুর্ন শূন্য শুষ্ক পতিত অনুর্বর, তার জীবনকে কতকগুলো নিরর্থক শব্দে পূর্ণ ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।, বিধবা হচ্ছে দন্ডিত নারী যে কোনো অপরাধ করে নি; কিন্তুরবেন্দ্রনাথ নিরপরাধ নারীর এ-দন্ডকেই মনে করেন হৃদয়ের চরিতার্থতা।

রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও নারীর প্রথাগত ছক ভেংগে নারীকে ব্যক্তি করে তুলার লোভ দেখিয়েছেন পাঠককে; আর অবিলম্বে তিনি নারীকে ছকে পুনর্বিন্যস্তকরে স্বস্থিপেয়েছেন ভারতীয় প্রথার কাছে নিঃশ্বেষ আত্মসমর্পনে। 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটিতে মেলে এর পরিচয়। মালতী এ-কবিতায় নিতে চেয়েছে প্রতিশোধ। 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতার দেবযানির মতো অভিশাপ দেয়ার সুযোগ পায় নি সে। তাই সে গণিতে হতে চেয়েছে প্রথম, বিলেতে গিয়ে করতে চেয়েছে ডক্টরেট। মালতী ছক ভেংগে বেরিয়ে পড়ে; প্রতাড়িত প্রেমিকা দিবাস্বপ্নে হয়ে উঠে মেধাবী ছাত্রী- তাও আবার গণিতের। সে বিলেতে যায়; তাঁর কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে প'ড়ে চারপাশ। কিন্তু মালতী ছক ভাঙ্গতে-না-ভাঙ্গতেই পুরুষতন্ত্রের মুখপাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ফিরিয়ে আনেন পুরুষতন্ত্রের ই চিরন্তন ছকের মধ্যে।

> মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
> সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
> যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
> দল বেঁধে আসুক ওর চারিদিকে।
> জ্যোতির্বিদের মতো আবিস্কার করুক ওকে-
> শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে;
> ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
> ধরা পড়ুক তার রহস্য-

এ-র প্রতিক্রিয়ায় ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেন :

> যদি নারীত্বই হয় তার শ্রেষ্ট পরিচয়, তাহলে গণিতে প্রথম শ্রেণী আরে বিলেতে গবেষণা হয়ে উঠে শোচনীয় পন্ডশ্রম। মালতী এতো কিছুক'রেও অর্জণ করেনি কোনো সাফল্যই। জ্ঞানী , বিদ্বান, বীর, কবি, শিল্পী, রাজারা ওর মাঝে আবিস্কার করবে এক-ছক বাঁধা নারীকে। এমনকি তাঁর বিদ্রোহী নারী যে উদ্বত প্রশ্ন করে :'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবারে / কেনো নাহি দিবে অধিকার / হে বিধাতা?', যে ঘোষনা করে :'যাব না বাসরকক্ষে বধুবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী', সেও ছকের মধ্যেই থেকে ব'লে : ' যাহা মোর অনির্বচনীয়/ তারে যেনো চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।' ওই অনির্বচনীয়টুকু হচ্ছে নারীত্ব, যা পুরুষতন্ত্রের অত্যন্তপ্রিয়।

নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আজীবন-পোষা ধারণার সারসংক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন ডঃ আজাদঃ

> নারী সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি ও বদ্ধমুল ক'রে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশ-একুশ বছর বয়সে- যা তিনি পুষেছেন আশি বছর বয়স পর্যন্ত। নারীর দুটি বিপরীত ধ্রুবরূপে বিশ্বাস করেছেন তিনি : প্রিয়া ও জননী, উর্বশী ও কল্যানী, বা পতিতা ও গৃহিনী। প্রিয়া -উর্বশী -পতিতা নারীর এক রূপ; জননী- কল্যানী-গৃহিনী আরেক রূপ। প্রথম রূপটির স্বপ্ন দেখেছেন তিনি কবিতার জন্যে, দ্বিতীয় রূপটিকে তিনি চেয়েছেন বাস্তবে। তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাসে এ-রূপ দুটি ফিরে ফিরে এসেছে। এ-রূপ দুটি তিনি পেয়েছেন হিন্দুপুরাণের সমুদ্রম স্থনণ উপাখ্যানে, এবং একে মনে করেছেন শ্বাশত চিরন্তন। রবীন্দ্রচিন্তায় এ-দু-নারী আদিম চিরন্তনী; এদের পরিবর্তন নেই , এরা রবীন্দ্রনাথ ও পুরুষতন্ত্রের দুই নারী-স্টেরিওটাইপ। এরা পরস্পরের বিপরীতঃ উর্বশী রূপসী, সে বেশ্যা, তাকে দেবদানব বা পুরুষ কেউ গ্রহণ করে নি; আর কল্যনীকে পুরুষ বন্দী করেছে নিজের গৃহে। নারীর দু-রূপকে পুরুষ আর রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেছেন তাতে নারী হয়ে উঠেছে এক শোচনীয় প্রাণীঃ যাকে গৃহে গ্রহন করা হয়নি, সে হয়েছে বেশ্যা-তার কাজ সকলের চিত্ত ও শরীরবিনোদন; আর যাকে গ্রহন করা হয়েছে, সে হয়েছে দাসী।

রবীন্দ্রসমালোচনায় ডঃ আজাদের উল্লিখিত মতগুলো থেকে আমরা দেখতে পাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে মুল্যায়ন করেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। তাঁর যেটুকু প্রশংসা পাওয়ার ডঃ আজাদ তা করেছেন; যতটুকি নিন্দা তাও প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি ডঃ হুমায়ুন আজাদ। রচনার কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার আশঙ্কায় 'নারী' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এমন আরো অজস্রবাজে ধারণার উল্লেখ করলাম না।

ডঃ বিপ্লব **মুক্তমনায়** বলেছেন যে সুনীল ও বুদ্ধদেব প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছেন, কিন্তুপরে তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু হুমায়ুন আজাদ তাঁর ভুল বুঝার বা স্বীকার করার সময় পান নি, এর আগেই তিনি মরে গেছেন। হাস্যকর লাগে ডঃ পালের এমন ভিত্তিহীন ভাবালু-অলীক উপলব্ধি দেখে। তিনি হুমায়ুন আজাদকে না পড়ে, তাঁর মানসিকতা না বুঝেই, জ্যোতিষীর মতো বলে ফেললেন এমন আগাম কথা! হুমায়ুন আজাদের বিশাল রচনার কোথাও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির ব্যাপারগুলোর মধ্যে স্ববিরোধীতা নেই। সকালে এক উপলব্ধি আর সন্ধ্যায় আরেক চেতনা- এমন মানসিকতার লোক ছিলেন না ডঃ আজাদ। তিনি যা বলেছেন তাতে বিশ্বাস করে, বুঝে শুনেই তিনি তা বলেছেন। তাঁর অনেক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু এমন আত্মঘাতি সীমাবদ্ধতা তাঁর ছিলো না; থাকলে তিনি আমাদের মত বাংলার মনন ও স্বপ্নশীল তরুন-তরুনীদের মনে এমন বিপ্লবী প্রভাব ফেলতে পারতেন না।

একই সময়ে বিভিন্ন স্ববিরোধী চেতনা লালন করা বাংঙ্গালিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আমরা সকালে ঘৃণা করছি ধর্মীয় আগ্রাসনকে, দুপুরে স্তব করছি সাম্রাজ্যবাদের, বিকেলে গান গাইছি প্রগতিশীলতার, আর সন্ধায় পূজা করছি প্রতিক্রিয়াশীলতার। একটি সংস্কার থেকে মুক্ত হতে না হতেই আরো অজস্রনিত্য নতুন সংস্কারের জালে বাধা প'রে যাচ্ছি আমরা। কেউ কেউ মুক্ত হচ্ছি ধর্ম থেকে, আবার জড়িয়ে পরছি ব্যক্তি পুজার জালে। বাংলার অনেক প্রগতিশীলও অনেকাংশে প্রতিক্রিয়াশীল; আধুনিকরাও সর্বাংশে আধুনিক নয়। রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক অজস্রবাজে ধারণা যখন ব্যাখ্যা ক'রে দেখাতে সচেষ্ট হচ্ছেন একদল সাহসী প্রতিভা, তখন অনেক আধুনিক প্রগতিশীলকেই দেখি নানা অজুহাতে নিরুৎসাহিত ক'রতে উদ্যোগী হচ্ছেন এমন সব বিপ্লবী প্রথা ভাংগা প্রতিভাদেরকে। এতে তারা ব্যবহার করেন নানা অস্ত্র; কখনো তারা বলেন রবীন্দ্রনাথকে আগে বুঝতে হবে, তাঁকে বুঝতে হলে জানতে হবে হিন্দু দর্শণ; আবার কেউ কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথের দু-একটি রচনা দিয়ে তাঁকে মূল্যায়ন করা ঠিক না। এদেরকে আমরা বলতে পারি উচ্চ শিক্ষিত, সংস্কার ও কিংবদন্তির বিচার বিবেচনাগুনবিরহিত অন্ধ স্তবকারী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির একবিংশ শতাব্দীর সংস্করণ।

কারো লেখা বই পূজার জন্যে নয়, নয় শিরোধার্য করার জন্যে। নিজস্ব চিন্তা ছাড়া বই পড়া বই না পড়ার চেয়েও খারাপ। নিজস্ব চিন্তা ছাড়া বই পড়লে পাঠক বিভ্রান্ত হবেন লেখকের নানা ধরনের অপযুক্তি দ্বারা। বের করতে পারবেন না বক্তব্যের মধ্যে সত্য-মিথ্যা টুকু।

জ্ঞানের এলাকায় শেষ কথা বলে কিছু নেই। পশ্চিমে জ্ঞানের কোনো এলাকায়ই শেষ কথা বলা হয় নি, প্রতিটি এলাকায়ই আরো অভিনব কথা বলার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু পশ্চাতমুখী বাঙালীদের কাছে একবার কারো বা কোন কিছুর মুল্য নির্ধারিত হয়ে গেলে- তা ভুল হোক আর সঠিক হোক, তাদের কাজ হয় তা পুনারাবৃত্ত করা; এর ভিন্ন মুল্যায়নে বাধা দেওয়া। আমাদের কাজ হয় ব্যক্তিপুজা। কেউ এর বিরুদ্ধে সত্য বললে চারিদিকে শোনা যায় প্রতিক্রিয়াশীলদের কোলাহল চিৎকার। এ-প্রবনতা বেশ অশুভ আমাদের মানস মুক্তির জন্যে।

একজন বন্দে আলী মিয়া কী বললো তাতে তেমন কিছু আসে যায় না; কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ কী বললো তাতে অনেক কিছু আসে যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙালী পাঠক সমাজে অত্যন্ত প্রবল। অনেকে রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি পোষণ করে অতিবাস্তব মোহ। সমালোচনার উর্ধে নন তিনি। তিনি মহান বলে, তাঁর প্রভাব আমাদের ওপর ব্যাপক বলেই আমাদেরকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখতে হবে তাঁর বক্তব্যের কতোটুকুসত্য, কতোটুকুবিভ্রান্তি; কতোটুকু প্রগতিমুখী আর কতোখানি প্রগতিবিমুখ; কতটুকু মানবমুক্তির পক্ষে আর কতটুকু মানবমুক্তির বিপক্ষে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং এর বক্তব্য আলো-বাতাসের মতো কাজ করে বাঙালীর চিন্তা ও মানস গঠনে। প্রথায় সুখ পাওয়া ও বক্তব্য বিষয়ে নিজস্ব চিন্তায় অনভ্যস্ত বাংগালি উল্লাস বোধ করে কিংবদন্তি শুনে শুনে। তদুপোরি বিষয়বস্তুর অন্তসারশুন্যতাকে অভাবিত শিল্পনিপূনতার বুননে ভাষার পোষাকে আকর্ষনীয় ও সত্যরূপ দিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয়। এর প্রভাবে আপাতযৌক্তিক অনেক বাজে কথাকে সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে পরম সত্য। রবীন্দ্রপ্রতিভার মহাপ্লাবনে তাঁর রচনায় নিহিত আগাছাও ধেয়ে আসতে পারে মূল্যবান সোনলী শস্যের সাথে বিবেচনাগুনবিরহিত বাঙালী পাঠকের চিন্তার ভুমে। এবং দশক পরম্পরায় বাঙালী পুনারাবৃত্ত করে যেতে একই মত, এর সত্যমিথ্যা বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে। তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতবাদের মধ্যে নিহিত সত্যমিথ্যা বা ভালমন্দটুকু আলাদা করে দেখিয়ে দেওয়া। এটা নিন্দনীয় নয়; বরং প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ উদ্যোগের জন্য মুক্ত-মনাকে ধন্যবাদ জানাই।